যুগান্তর
2 9 OCT 2013
পৃ 20 কলাম ...

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিন দশকে সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা লোপাট

মুশতাক আহমদ

দেশের বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিগত তিন দশকে সরকারের অন্তত সাড়ে ৪শ' কোটি টাকা লোপাট করেছে। এ অর্থের সবই এমপিও খাতের, যা সরকার শিক্ষকদের বেতন হিসেবে দিয়ে থাকে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অবৈধ নিয়োগ পেয়ে এমপিও গ্রহণ, এমপিওভুক্ত শিক্ষকের মৃত্যুর পরও তার নামে বেতন উত্তোলন করে আত্মসাৎ, শিক্ষক নিয়োগ না দিয়েই এমপিও গ্রহণসহ নানাভাবে ওই অর্থ লোপাট করা হয়েছে।

অভিযোগ রয়েছে, সরকারি এই অর্থ লোপাটের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং দুর্নীতি ধরার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান 'পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতর'র (ডিআইএ) একশ্রেণীর কর্মকর্তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। এক্ষেত্রে এই চক্রটি একদিকে অবৈধ এমপিও ছাড়ে সহায়তা করে। আরেকদিকে দুর্নীতির মাধ্যমে এমপিও আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়লেও পার করে দেয়া হয়। দুর্নীতির মাধ্যমে এমপিও দেয়ায় এমন একটি চক্র সম্প্রতি মাউশিতে ধরাও পড়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে

লোপাট : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

লোপাট : কোটি টাকা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

রহস্যজনক কারণে দুষ্কৃতকারীরা পার পেয়ে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতির দায়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়া হলেও মন্ত্রণালয়, মাউশি এবং ডিআইএ কর্মকর্তারা থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। আবার এসব প্রতিষ্ঠানের কেউ ধরা পড়লেও তাদের বদলি বা ওএসডির মধ্যেই শাস্তি সীমিত রাখা হয়। এভাবে কিছুদিন পর আবার তাদেরই অপেক্ষাকৃত ভালো পদে পদায়নের ঘটনাও রয়েছে।

এমপিওর অর্থ লুটপাটের এই চিত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এক অনুসন্ধানেও ধরা পড়েছে। সম্প্রতি স্থায়ী কমিটি ডিআইএর কার্যক্রমের ওপর এক তদন্ত পরিচালনা করে। গত ২৩ অক্টোবর ওই স্থায়ী কমিটির এক সভায় তদন্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়। এতেও এমপিওর অর্থ লুটপাটের বিষয়টি উঠে এসেছে।

ওই কমিটির প্রধান অধ্যক্ষ শাহ আলম এমপি যুগান্তরকে জানান, তাদের অনুসন্ধানে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৪৪০ কোটি টাকা অতিরিক্ত গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা ডিআইএ তাদের বিগত ৩১ বছরের তদন্তে চিহ্নিত করেছে। ডিআইএ ওই অর্থ সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে গ্রহণ শেষে সরকারি কোষাগারে জমা দিতে বলেছে। তিনি আরও বলেন, তবে প্রকৃত চিত্র আরও করুণ। কেননা ডিআইএর যারা স্কুল-কলেজে পরিদর্শনে যায়, তাদের অনেকে নানাভাবে ম্যানেজ হয়ে দুর্নীতির প্রকৃত তথ্য রিপোর্টে দেখে না। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ নিয়ে দুর্নীতির চিত্র গোপন করে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাহিদামতো অর্থ না পেলে মিথ্যা তথ্যও রিপোর্টে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ফাঁসিয়ে দেয়ার ঘটনাও রয়েছে। তিনি বলেন, ডিআইএর কার্যক্রম তারা জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের বিভিন্ন জেলায় সরেজমিন পরিদর্শনও করিয়েছেন। এক্ষেত্রে একটি এনজিওর সহায়তা নেয়া হয়।

শিক্ষার মানসহ প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সরকারি নিয়ম-নীতি অনুসরণ, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা, সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে ১৯৮০ সালে ডিআইএ প্রতিষ্ঠা করে সরকার। প্রতিষ্ঠাকালে দেশে এর আওতাধীন স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা ছিল ৭ হাজার ২২১টি। তখন এর জনবল ছিল ১৩০ জন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর ২৭ হাজার ৬৪৭টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত। প্রতিষ্ঠার বছরই ডিআইএ সারা দেশে ১ হাজার ৬১০টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে। সে বছর তারা এসব প্রতিষ্ঠানের ১০ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩ টাকার দুর্নীতি উদ্ঘাটন করে। পরে ওই টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত আনার ব্যাপারে তারা সরকারকে সুপারিশ করে। ১৯৮২-৮৩ সালে ডিআইএ ২ হাজার ৭৭টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে। সে বছর প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতির পরিমাণ আরও বেশি পাওয়া যায়। ডিআইএর তদন্ত দল তাদের পরিদর্শিত মোট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১ হাজার ৮২০টির প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করে। এতে সব মিলিয়ে ১ কোটি ৩৪ লাখ ২৮ হাজার ৮৫ টাকা অনিয়ম ও অপচয়ের চিত্র বেরিয়ে আসে, যা সরকারি কোষাগারে ফেরত নেয়ার সুপারিশ করা হয়। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিগত তিন দশকের মধ্যে সরকারি অর্থ তছরুপের সবচেয়ে বড় ঘটনা ডিআইএ উদ্ঘাটন করেছে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে। ওই বছর তারা ২ হাজার ৫৩৩টি পরিদর্শন রিপোর্ট সরকারের কাছে দাখিল করে। এতে তারা প্রতিষ্ঠানগুলোর ৫৭ কোটি ১৩ লাখ ৪৭ হাজার ৮১৬ টাকা লোপাটের চিত্র বের করে। সরকারি অর্থ লোপাটের তথ্য উদ্ঘাটনের দ্বিতীয় বড় ঘটনা ধরা পড়ে এর পরের বছর ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে। ওই বছর ৫৩ কোটি ৯১ লাখ ৯৮ হাজার ৯১৬ টাকার অনিয়ম ও অপচয় উদ্ঘাটন করা হয়, যা সরকারি কোষাগারে জমাদানের নির্দেশনা ছিল। ২০০১ সালের পর ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিকসহ বিভিন্ন দুর্নীতি ধরা পড়ার হার বেশি ছিল। অর্থাৎ সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ওই সময়ে তদন্ত অনেকটা নির্মোহভাবে হয়েছে। যে কারণে আর্থিক দুর্নীতি উদ্ঘাটনের হার বেশি ছিল। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি উদ্ঘাটনের হার কমতে থাকে। দেখা গেছে, যেখানে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৩৫ কোটি ৩১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৪৪ টাকার দুর্নীতি ধরা পড়ে, সেখানে পরের বছরই তা অর্ধেকে নেমে আসে। ওই বছর ১৮ কোটি ৯ লাখ ৪৬ হাজার ২৬৩ টাকার অনিয়ম ধরা পড়ে। এরপর তা প্রতি বছরই কমতে থাকে। এক পর্যায়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে তা নেমে দাঁড়ায় ৫ কোটি ৪৮ লাখ ৬৮ হাজার টাকায়। অবশ্য ডিআইএ'র গেলো অর্থবছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতি করে অর্থ লোপাটের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৫০ লাখ ৬ হাজার ৪৮৩ টাকা। এর আগে নব্বইয়ের দশকের শেষে বা ১৯৮৯-৯০ সেশনে ডিআইএ স্বার্থরক্ষার ১৩ কোটি ৭১ লাখ ৮৯ হাজার ৩৭১ টাকার দুর্নীতি ধরেছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির যথার্থ চিত্র বের না হওয়া প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং ডিআইএর কার্যক্রম তদন্ত দলের প্রধান অধ্যক্ষ শাহ আলম এমপি যুগান্তরকে বলেন, তাদের কাছে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে যে ডিআইএর কতিপয় পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের জিম্মি করে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করে থাকে। কয়েক বছর আগে তার নিজের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও এরকমভাবে ভিকটিম হয়েছিল বলে জানান তিনি। অধ্যক্ষ আলম আরও বলেন, পরিদর্শনকালে ডিআইএর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেবল আর্থিক ও নিয়োগ সংক্রান্ত দিকই নয় শিক্ষাসহ অন্যান্য দিকও দেখার কথা। কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে একাডেমিক দিক দেখে না বললেই চলে। ডিআইএর বিরুদ্ধে সারাদেশের শিক্ষকদের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ সরেজমিন নিরীক্ষার জন্য তারা রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ গিয়েছেন। তারা কতিপয় কর্মকর্তার অসততার প্রমাণ পেয়েছেন বলে জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, দুর্নীতির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরাও কম দায়ী নন। ডিআইএর পরিদর্শনের তারিখ নির্ধারিত হলে অনেক প্রতিষ্ঠান প্রধান নিজ নিজ স্কুল-মাদ্রাসায় চাঁদাবাজি করেন সব জনবলের কাছে। এরপর ওই চাঁদার অর্থ কিছু পরিদর্শন দলকে দেন। বাকিটা লোপাট করেন।

পদোন্নতি চান না কর্মকর্তারা : এদিকে ডিআইএতে চাকরি করা শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাছে অনেকটা লোভনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পদ এতটাই লোভনীয় যে, যারা আছেন তারা অনেকে বদলি কিংবা পদোন্নতি নিতে চান না। আবার অনেকে মোটা অঙ্কের অর্থ দিয়ে পদায়ন নিয়ে থাকেন সেখানে। এ ব্যাপারে সংসদীয় কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিপুল অর্থ ব্যয় অনেকে ডিআইএতে পদায়ন নেন। আবার প্রদত্ত অর্থের বহুগুণ দুর্নীতির মাধ্যমে আদায় করে নেন। এতে আরও বলা হয়, পদায়নের আগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অভিজ্ঞতা বা সততার বিষয়টি দেখা হয় না।

এমনকি দুর্নীতির দায়ে চিহ্নিতদের পর্যন্ত এতে পদায়ন করা হয়। এমনি একটি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে সম্প্রতি। গত বছরের ২৬ নভেম্বর সেখানে মো. শামসুজ্জামান নামে এক কর্মকর্তাকে উপ-পরিচালক বানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, সহকারী অধ্যাপক পদের শিক্ষা ক্যাডারের এই কর্মকর্তা এর আগে দুর্নীতির দায়ে ১৩ মাস ওএসডি ছিলেন। এর আগে আরেকবার তিনি একই প্রতিষ্ঠানে (ডিআইএ) প্রায় ৮ বছর চাকরি করেছিলেন।

আস্থা নেই ডিআইএতে : সংশ্লিষ্টরা জানান, এসব কারণেই ডিআইএর তদন্তে আস্থা নেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। যে কারণে ২০১০ সালের ৫ জুলাই ডিআইএর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান তথা প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষসহ অন্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রণালয়। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (অডিট ও আইন) স্বাক্ষরিত পরিপত্রে বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম সম্পর্কে ডিআইএর তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এর ফলে পরবর্তীতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ থাকে না।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : জানতে চাইলে সম্প্রতি সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. রাম দুলাল রায় তার আমলে ডিআইএ দুর্নীতিমুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন, একসময় ডিআইএতে দুর্নীতির হাট বসতো। ইচ্ছামতো টাকা নিতো কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। পিয়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে যারা চাকরি করছেন তাদের সম্পদের হিসাব নিলেই দুর্নীতির চিত্র বেরিয়ে আসবে। প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বলেও তিনি স্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে ডিআইএ পরিচালক অধ্যাপক খান হাবিবুর রহমান বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি সম্প্রতি ডিআইএর ওপর একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে। তাতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা রয়েছে। বিশেষ করে কমিটি ১৪টি সুপারিশ করেছে। বিভিন্ন সুপারিশের মধ্যে ভালো ও সৎ ব্যক্তিদের ডিআইএতে পদায়ন আর দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের বারবার পদায়ন না করার সুপারিশ রয়েছে। তিনি বলেন, পদায়নের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের। তিনি কেবল সহকর্মীদের নিয়ে কাজ করে থাকেন। এটা তার হাতে নয়।

অধ্যক্ষ শাহ আলম বলেন, তারা সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছেন। তাদের প্রত্যাশা সুশাসনের লক্ষ্যে সুপারিশ বাস্তবায়িত হবে। কেননা তারা অনেক সময় নিয়ে নির্মোহভাবে তদন্ত করেছেন। দেশের স্বার্থে তা বাস্তবায়ন হওয়া দরকার।